নিউইয়র্কের ‘ঠিকানা’য় হুমায়ুন আজাদের অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার
নিজ দেশে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর যে ক্ষমতা
আমেরিকার প্রেসিডেন্টেরও সেই ক্ষমতা নেই

নিউইয়র্ক থেকে এনা: বাংলাদেশের বিখ্যাত লেখকদের অন্যতম ছিলেন অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ। । হুমায়ুন আজাদের এই সাক্ষাতকারটি গ্রহণ করা হয়েছিলো নিউইয়র্কে ২০০২ সালে নিউইয়র্কস্থ বাংলা টিভির পক্ষ থেকে । প্রিন্ট মিডিয়ায় এটি প্রকাশিত হয়নি। তাকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে সাক্ষাতকারটি মরণোত্তর প্রকাশ করা হয় উত্তর আমেরিকায় সর্বাধিক প্রচারিত ঠিকানা’র ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যায়-যা ১৯ ফেব্রুয়ারিতে বাজারে এসেছে। এই সাক্ষাতকারে তিনি বাংলাদেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প- সাহিত্য নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। রাজনীতির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, নিজ দেশে বংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর যে ক্ষমতা তা আমেরিকার প্রেসিডেন্টেরও নেই।

আরো বলেন, বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি রাজনীতিবিদ, সচিব এবং সরকারি অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকতারা দুর্নীতিবাজ। বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রধান বাঁধা হিসাবে তিনি দুর্নীতিকে চিহ্নিত করেছেন। সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশে সাহিত্যের জন্য শ্রেষ্ঠ সময় ছিলো ৬০ এর দশক এবং জনপ্রিয় সাহিত্য সম্পর্কে বলেছেন, এগুলো সাবওয়ের সাহিত্য, অপ্রাপ্তবয়স্কদের সাহিত্য। নারী বই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপি এবং সচিবদের কোন শক্তি নেই নারী বইটি বুঝার। অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ বাংলাদেশে প্রথাবিরোধী লেখক হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। সমগ্র ছাত্র জীবনেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। পরীক্ষাতে প্রথম- দ্বিতীয় স্থানটি নির্ধারিত থাকতো যেন তার জন্যই। লেখালেখিতেও ছিলেন দারুণ মেধাবী। অজস্র লিখেছেন। আর হুমায়ুন আজাদের লেখা মানেই নতুন সেন্সেশন, ভিন্নমাত্রার রোমাঞ্চ। প্রগতিশীলদের কারো কারো কাছে ছিলেন চোখের মনি, আবার ঈর্ষান্বিতও ছিলেন অনেকে। তবে প্রতিক্রিয়াশীল চরম ডানপন্থী এবং ধর্ম ব্যবসায়ীদের সকলের কাছে ছিলেন দু-চোখের বিষ এবং এই গোষ্ঠির হাতে অকালে প্রাণ দিয়ে তার মুল্যও তিনি শোধ করে গেছেন।

ঢাকার বিক্রমপুরের রাড়িখালে জন্মেছিলেন ১৯৪৭- এর ২৮ এপ্রিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। বৃটেনের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন। তাঁর লেখা এবং প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ৬০ এর অধিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ‘নারী।’ যা সরকারি রোষাণলে পড়ে নিষিদ্ধ থাকে সাড়ে চার বছর। এছাড়া অনুবাদ গ্রন্থ দ্বিতীয় লিঙ্গ (মূল লেখক সিমোন দ্যা বোভায়ার)। অন্যান্যের মধ্যে অলৌকিক ইস্টিমার, জ্বালো চিতাবাথ, সব কিছু নারীদের অধিকারে যাবে, কথা সাহিত্য ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল, মানুষ হিসেবে আমার অপরাধ সমুহ, আমার অবিশ্বাস, আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম, বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র, কিশোর সাহিত্য লাল নীল দীপাবলী, ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, আব্বুকে মনে পড়ে, আততায়ীদের সঙ্গে কথোপকথোন, রবীন্দ্র নাথের প্রধান কবিতা উল্লেখযোগ্য।

তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে রাজাকার- আলবদরদের ভুমিকা নিয়ে ‘পাকসার জমিন সাদ বাদ’ লিখে ঘাতকদের রোষাণলে এমনভাবে পড়েন যে নিজেকে আর রক্ষা করতে সক্ষম হননি। ২০০৪ সালে বাংলা একাডেমির বইমেলা থেকে বের হয়ে ঘরে ফেরার পথে মেলার অদুরেই আক্রান্ত হন। দীর্ঘদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠলেও সেই আঘাতের চাপেই জার্মানীর মিউনিখে যেয়ে নি:সঙ্গ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন ২০০৪ সালের ১১ আগস্ট। হুমায়ুন আজাদ সশরীরে আমাদের মাঝে না থাকলেও তিনি নিত্য আলোচিত। তার অভাবও দেশপ্রেমে উজ্জীবীত মানুষ প্রতিনিয়ত অনুভব করেন। এ সাক্ষাতকারে তিনি আরো অনেক কথা বলেছেন, যা পাঠকদের জন্য এখানে উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্ন: নিউইয়র্ক আপনার কাছে কেমন লাগছে?

হুমায়ুন আজাদ : আমি নিউইয়র্কে এসেছি নভেম্বরে। আমার শরীর বিকলনগ্রস্থ, মস্তিষ্ক ঠিকভাবে কাজ করছে না। তবুও বলি নিউইয়র্ক শহর সম্পর্কেতো আমার পূর্ব ধারণা ছিলো। আমি নিউইয়র্কে আসিনি সত্যি, কিন্তু নিউইয়র্ক সম্পর্কে আমার জানা ছিলো। নিউইয়র্কে এর মধ্যে বড় ধরনের ঘটনা হচ্ছে ৯/১১ এর ঘটনা। এটি একটি গুরম্নত্বপূর্ণ ঘটনা। নিউইয়র্ক নগরীতে যখন আমার বিমান আসে তখন অনেকক্ষণ উপরে ঘুরেছে, অবতরণ করতে পারেনি। বার বার ঘুরেছে, আমি বার বার দেখেছি নিউইয়র্ক সিটিকে। এটা আমার মনের মধ্যে একটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। নিউইয়র্ক চিরকালই আমার প্রিয় শহরগুলোর মধ্যে একটি। নিউইয়র্ককে আমি জানি বিশাল নগরী হিসাবে। একটি মুক্ত নগরী হিসাবে। প্রধান নগরী হিসাবে। এখানকার শিল্প-সাহিত্যের কথা আমার সব সময় মনে পড়ে। আমি মোটেও ভাবিনি নিউইয়র্কে আসবো বলে। কারণ আমি ২৭ বছর বাংলাদেশের বাইরে যাইনি। যদিও ভারতে গিয়েছি দুই বার।

কেন দেশের বাইরে যাননি?

হুমায়ুন আজাদ এর উত্তর: এটা আমার খুবই একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি যখন যুক্তরাজ্য থেকে পিএইচডি ডিগ্রি শেষ করে ১৯৭৬ সালে দেশে ফিরছিলাম তখন সমস্যাটির সৃষ্টি হয়। আমি অবশ্য বাধ্য হয়েছিলাম বাংলাদেশ বিমানে আসতে। আমরা যখন বিমানে আরাম করে বসলাম। ঐ সময় আমাদের জানানো হলো বিমানের যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছে, কয়েক ঘন্টা পর বিভিষীকাময় পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ বিমান আকাশে উড়লো। এরপর ঠিক করেছিলাম আর কখনো বিমানে উঠবো না। তারপরও দেশের বিমানে উঠেছি, অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে দেশের বিভিন্ন জায়গা গিয়েছি, ভারতে গিয়েছি। তাছাড়া লেখালেখি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্থ থেকেছি। চিন্তা করে দেখেছি বিদেশে গিয়ে কী হবে? নিউইয়র্ক একটি বিশাল নগরী। অত অল্প দিনের মধ্যে তো নিউইয়র্কের রহস্য ভেদ করা অত্যন্ত দুরহ ব্যাপার। আমি এই বিশাল নগরীর মধ্যে রয়েছি, এখনো আমি এই নগরীর অন্তর্ভুক্ত হইনি। আর আমার অনুর্ভুতি হবারও খুব একটা ইচ্ছে নেই। আর অনুর্ভুতি হবার বয়সও আমার নেই।

আমার যখন ২৫ বছর বয়স ছিলো আমি তখন লন্ডনে ছিলাম। এডিনবোরোয় ছিলাম। সে কি চাঞ্চল্যকর জীবন। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে বাস করেছি। আমার ছাত্রাবাস ছিলো মিশ্র। আমার পাশেই ছিলো একটি তরম্নণী। তারপাশের ঘরেও ছিলো বিদেশী তরম্নণী। আমিই ছিলাম একমাত্র বাংলাদেশী ছাত্র। যেখানে চীনা ছিলো, ফরাসী ছিলো, ইংল্যান্ডের ছাত্রছাত্রী ছিলো। বিশাল এক ছাত্রাবাস। দেখতে মনে হতো গুচ্ছের মতো। আর আমি যে জীবন যাপন করেছি তা ছিলো ইউরোপীয়ানদের মত। আমি যাদের সঙ্গে ছিলাম, তাদের সাথে আমার চমৎকার সম্পর্ক ছিলো। মনে হতো বাংলাদেশী জীবন যাপনের মধ্যে আছি। তারপরও মনে হতো আমি যেন পিছিয়ে আছি। এখানে চমৎকার জীবন যাপন, সব কিছুই অত্যাধুনিক কিন্তু বাংলাদেশে সেই জীবন নেই, তাই আমরা পিছিয়ে।

যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন তারা লেখাপড়ার পাশাপাশি জীবনকে উপভোগ করছেন, বাংলাদেশে তা হয় না। বাংলাদেশের মানুষ নানা রকম সংকটের মধ্যে তাদের জীবনযাপন অতিক্রম করছেন এবং আমি জানি বাংলাদেশের মহিলারা প্রতিনিয়ত সমস্যার সম্মুখীন। তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের জীবনের কথা বলার সময় কান্নাকাটি করেছেন। বিদেশে যে সব বাঙালি রয়েছেন, তারাও তাদের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্থ। তাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছেন যারা ২০ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত বিদেশে। তারা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করছেন, সংসারে সময় দিতে পারছেন না। অধিকাংশ মহিলা বাসার মধ্যে বন্দি। এরি মধ্যে আমি সবাইকে আপন করে নিয়েছি। নিউইয়র্কে যেসব বাংলাদেশী রয়েছেন তারা বেশ সুযোগ- সুবিধা পাচ্ছেন কিন্তু মূলধারায় বাংলাদেশী নেই।

প্রশ্ন: আপনি বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী মহিলাদের কথা বলছেন তারা ঘরের মধ্যে বন্দী কিন্তু বাংলাদেশে মহিলারা কি স্বাধীন?

হুমায়ুন আজাদ : বাংলাদেশের অবস্থা খুব মজার। বাংলাদেশে যারা মধবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী তারাতো অর্থ উপার্জনের জন্য ছুটছেন। তাদের স্বামীরা সকালে ওঠেই কাজে চলে যাচ্ছেন, কাজ শেষে রাতে বাসায় ফিরছেন। বাংলাদেশে দ্রারিদ্র্য রয়েছে, বাংলাদেশে সীমাহীন যন্ত্রণা রয়েছে, যানজটসহ নানা রকম সমস্যা রয়েছে। কিন্তু সেখানে উচ্চবিত্তরা ভালই আছেন। আমরা যারা মধ্যবিত্ত রয়েছি, তারা উদবেগহীন জীবন যাপন করি। সোজা কথায় বলা যায়- আমরা একটি চক্রের মধ্যে জীবন যাযন করছি। যেমন আমার বাড়ির কথাই বলি। আমি আমার বাসায় বিদেশী টেলিভিশনগুলো দেখি, আমার মেয়েরাও দেখে। আমার স্ত্রী-পুত্রও দেখে। নিউইয়র্ক সম্পর্কে আমি বাংলাদেশে বসে সংবাদ দেখি। আমি লক্ষ্য করেছি- নিউইয়র্কে যারা বাস করেন, অনেক সময় তারাও সেই সব খবর পান না। ১১ সেপ্টেম্বর যে নৃশংস ঘটনা ঘটেছে, তার সাথে সাথেই কিছু মিডিয়া থেকে আমাকে ফোন করে মতামত চাওয়া হয়েছিলো। তখন আমি বলেছিলাম আমিতো এখনো কিছু জানি না, আমাকে টেলিভিশন দেখার জন্য বলা হলো। আমি টেলিভিশন খোলার কিছুক্ষণ পরে দেখলাম দ্বিতীয় বিমানটি অট্টালিকা আক্রমণ করলো, আমি সরাসরি দেখতে পেলাম। আমি নিউইয়র্কে এক আত্মীয়কে ফোন করলাম। তারা জানালো তারা জানে না। তারা টিভি খুলে দেখতে পেল সেই বিভৎস পরিস্থিতি। নিউইয়র্কে জীবনের অন্বেষণে এসে যারা এখন স্বচ্ছল, তাদের সবার মন পড়ে আছে বাংলাদেশে। সাধারণ বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তারা হয়ত নিউইয়র্কে কোন ছোট বাসায় থাকেন, নয়ত কোন বেইসমেন্টে থাকেন, অনেকে হয়ত নিজের কেনা বাড়িতে থাকেন। কিন্তু মনে মনে তারা সবাই বাংলাদেশে রয়েছেন। তাদের সন্তানরা যারা জন্ম নিচ্ছেন, তারা এক সময় মার্কিনী হয়ে ওঠবেন, তারা বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন।

প্রশ্ন: বাংলাদেশে অফুরন্ত সময় বাংলা সাহিত্য চর্চা করার বা বাংলা সংস্কৃতি লালন করার কিন্তু নিউইয়র্কে এসে আপনি লোকজনের সাথে কথা বলেছেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়েছেন। এখানে বাংলা সংস্কৃতি বা সাহিত্য চর্চা সম্পর্কে আপনার মুল্যায়ন কী?

হুমায়ুন আজাদ : প্রথম কথা হলো শিল্প, সাহিত্য- সংস্কৃতির সাথে তো সব মানুষের সম্পর্ক থাকে না বা যুক্ত থাকে না। কিন্তু নিউইয়র্কে আমি এখন যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছি- তা হচ্ছে বাঙালিরা খুবই গৃহকাতর। তাদের মধ্যে কেউ গাড়ি চালাচ্ছেন, কেউ কোন রেস্টুরেন্টে কাজ করছেন- তারা মোটামুটি পরিশ্রম করছেন এবং ভালই আছেন। আরেক ধরনের বাঙালি আছেন যারা অধ্যাপনা করছেন, ভাল চাকরি করেছেন, ভাল ব্যবসা করছেন, তারা কিন্তু বাঙালিদের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং এরা অন্তর্ভুক্ত নয়। সে কারণে শিল্প- সাহিত্য থেকেও তারা দূরে। আমার মনে হয় যারা বাঙালি এখানে আছেন তাদের প্রথম প্রজন্ম এ পর্যায়কে অতিক্রম করে যাচ্ছেন, তাদের শেকড় বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারা কিন্তু এখন সাহিত্য সৃষ্টির কথা ভাবছে না। আমার খুব ভাল লাগছে এ জন্য যে নিউইয়র্ক থেকে চমৎকার পত্রিকা বের হচ্ছে। নিউইয়র্কের পত্রিকাগুলো আমার কাছে বাংলাদেশের পত্রিকাগুলোর তুলনায় সুস্থ মনে হয়। নিউইয়র্কে বাংলাদেশীরা যে টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপন করেছেন- এগুলো সৃষ্টির বহি:প্রকাশ। বাঙালি এখানে প্রথম পর্যায়ে শুধু কর্মী বাঙালি নয়, শুধু শ্রমিক বাঙালি নয়, তারা এখানে কোন রকমে বিভিন্ন স্থানে কাজ করে- আমেরিকার সমাজ সম্পর্কে কিছু না জেনে জীবন যাপন করছেন না- তারা এখন সৃষ্টিশীল, তারা কবিতা লিখছেন, প্রবন্ধ লিখছেন, উপন্যাস লিখছেন, পত্রিকা প্রকাশ করছেন, টেলিভিশন চ্যানেল করছেন, বাংলা ভাষার চর্চা করছেন- এটা বাংলাদেশ এবং বাংলা সাহিত্যের জন্য অবশ্যই আশান্বিত একটি দিক।

প্রশ্ন: আমেরিকাকে ভোগ করা যায়, ভালাবাসা যায় না- এ কথাটি আপনি কেন বলেছেন- বলবেন কি?

হুমায়ুন আজাদ : আমি কথাটি এভাবে বলছি- নিউইয়র্ক এমনই রূপসী, যাকে সবাই ভোগ করতে চায় কিন্তু কেউ ভালবাসে না। আমি কিন্তু নিউইয়র্ককে মনে মনে খুব ভালবাসি। যদিও আমি বাংলাদেশে থাকি। নিউইয়র্ক আমার স্বপ্নের নগরীগুলোর একটি। যেমন আমি পছন্দ করি লন্ডন, আমি পছন্দ করি প্যারিস। নিউইয়র্ক ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কোন নগরী আমি পছন্দ করি না। ওয়াশিংটন আমার স্বপ্নের মধ্যে নেই। ওয়াশিংটনকে আমি কখনো সৃষ্টিশীল বা শৈল্পিক নগরী মনে করি না। নিউইয়র্ক একটি সত্যিই একজন তরুন্নী রাণীর মত, অপুর্ব রূপসী, অসম্ভব সুন্দর, অসাধারণ। আমি যখন নিউইয়র্কে সাবওয়ে দিয়ে যাই, যখন আমি নিউইয়র্কের পথে হাঁটি তখন অনুভব করি। এখন তো নিউইয়র্কে আমার অনুরাগীর সংখ্যা বেশি, আমি ইচ্ছে করলে গাড়িতেই চড়তে পারি। আমি যখন এডেনবোরতে ছিলাম তখন আমি নিজে ড্রাইভ করেছি।

নিউইয়র্কে আমি ইচ্ছে করলে এক বছর থাকতে পারি বিভিন্ন বাসায় বাসায়- আমার অনুরাগীদের কাছে। নিউইয়র্কের জন্য আমার গভীর মায়া রয়েছে। আরেকটি শহরের প্রতি আমার মায়া রয়েছে সেটি হচ্ছে ঢাকা। ৯/১১ এর পর আমি বলেছিলাম – এটা একটি বিভৎস কাজ, আমি নিন্দা জানিয়েছিলাম। কিন্তু অন্যান্য বুদ্ধিজীবী, যারা খুবই বুদ্ধিমান তারা কিন্তু আমার বক্তব্যের নিন্দা জানিয়েছিলেন। তারা ঘটনার জন্য নিন্দা জানাননি। আমার দু:খ লেগেছে- যারা এমন দুটো সুন্দর দালানকে কেউ ধ্বংস করতে পারে! টুইন টাওয়ার আমার কাছে ছিলো সৌন্দর্য্যের স্তম্ভ।

প্রশ্ন: আপনার নারী উপন্যাসটি কেন ব্যান্ড করে দেয়া হলো?

হুমায়ুন আজাদ : নারী উপন্যাসটি ব্যান্ড করা হয়েছিলো- সম্ভব ১৯৯৫ সালের নভেম্বর মাসে। আমি উচ্চ বিচারালয়ে যাই এবং ২০০০ সালের ৭ মার্চ বইটি মুক্তি পায়। মজার বিষয় হলো- বইটি যদি সরকার নিষিদ্ধ করতে চায়, তাহলে প্রথমে জানানো উচিত বইটির লেখককে, আপনার কি মত? আত্মপক্ষ সমর্থন করার কিছু আছে কি? আমাকে তার কিছুই জানানো হয়নি। নিষিদ্ধ করার পরও আমাকে জানানো হয়নি। আমি পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছি, আমার বইটি নিষিদ্ধ করা হলো। আমি যখন উচ্চ বিচারালয়ে মামলা করি, তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব যিনি আমার অনুরাগী, তিনি আমাকে সমস্ত কাগজপত্র সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। আমি দেখতে পাই কয়েকজন অশিক্ষিত আমলা, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কয়েকজন কর্মকতা ও ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কিছু লোকের মতামত নেয়া হয়েছে। নারীতো বিশাল একটি বই এবং এটা কিন্তু সুখপাঠ্য না। তারা দশটি কারণ দেখিয়ে বলেছে- বইটি নিষিদ্ধ করা যায়। অথচ তারা বইটি পড়েনি। নারী বইটি পড়ার শক্তি বাংলাদেশের কোন সচিবের, কোন মন্ত্রীর, কোন প্রধানমন্ত্রীর নেই। বইটির নাম নারী হলেও বইটি নারীদের জন্যও উপভোগ্য নয়। তারা যে কারণগুলোর কথা উল্লেখ করেছিলো, তার চেয়ে মারাত্মক বিষয় এ বইতে ছিলো। তারা সেগুলোর কথা উল্লেখ করেনি, কারণ তারাতো বইটি পড়েনি। তারা যে কোন একটি বাক্যের কথা উল্লেখ করেছে।

মজার বিষয় হলো- বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র কি রকম। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে- এই বইটির প্রথম সংস্করণ নিষিদ্ধ করা হলো। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নামক যে নির্বোধ প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে, তারা শুধু প্রথম সংস্করণ লেখাটি দেখেছে অন্য কিছু দেখেনি। ইতিমধ্যে কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় সংস্করণ বের হয়ে গিয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের যে সব সচিবরা রয়েছেন তারা মনে করেছে সব সংস্করণই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমার আইনজীবী যখন উচ্চ বিচারালয়ে এটি উপস্থাপন করলেন তখন বিচারপতি তা গ্রহণ করতে রাজি হননি। ব্যারিস্টার আমিরুল্ল ইসলামের মত ব্যারিস্টার- তিনি ছয় ঘন্টা ধরে যুক্তি দিয়েছেন। যে বইটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাতে সংবিধান লংঘন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উচ্চ বিচারালয়ে যাবার পর প্রায় সাড়ে চার বছর এ বিষয়ে আর কোন আলোচনা হয়নি, আদালতে ওঠানো হয়নি। আমি বার বার আমার আইনজীবীসহ আদালতে গিয়েছি। এক সময় সব আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। ধরে নিয়েছিলাম এই বইটি হয়ত প্রকাশিতই হবে না। তারপর হঠাৎ এক দিন আমার আইনজীবী বিষয়টি উপস্থাপন করলেন এবং বিচারপতিও রাজি হলেন এবং দুই তিন দিনের মধ্যে রায় হয়ে গেল। রায়টিও ছিলো খুব মজার। ঐ সময় আমি আদালতে বসে ছিলাম। আমি বুঝতেও পারিনি। আমার পাশে একজন বসেছিলেন, তিনি বললেন, স্যার আপনার পক্ষে

রায় হয়ে গিয়েছে। আমি কিন্তু উৎফুল্ল হইনি। কারণ বিচারপতি যেভাবে রায় দিয়েছেন সেটা আমার কাছে খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক বলে মনে হয়নি।

প্রশ্ন: বইটি নিষিদ্ধ করার কারণ কি রাজনীতি না ফতোয়াবাজদের কারসাজি?

হুমায়ুন আজাদ: এটা হলো আমাদের সরকারের প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রকাশ। তবে বইটি যখন নিষিদ্ধ করা হয় তখন শুনা গেল- এর পিছনে যে সরকার সম্পূর্ণ জড়িত তা কিন্তু নয়। এখানে হয়ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীকে কেউ বুঝিয়েছেন, নিশ্চয় ডান পন্থীরা এ কাজটি করেছে। তখন যিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন তিনি হয়ত মাধ্যমিক পাশও নন। তারপক্ষে তো আমার বই পড়া সম্ভব নয়। আমি যখন মামলাটি করি তখন হাই কোর্টের গেটে একজন আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি আমাকে বললেন- জানেন আমিও আবেদন করেছিলাম আপনার বইটি নিষিদ্ধ করার জন্য। আমি তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কিছুই বলিনি।

প্রশ্ন: আপনি তো এক সময় পত্রপত্রিকায় কলাম লিখতেন- এখন লিখছেন না কেন?

হুমায়ুন আজাদ : স্বৈরাচার পতনের পর আমার ছয়টি বই প্রকাশিত হবার কথা। তাছাড়া বাংলাদেশে কলাম লেখা মানেই একই কথা বার বার ফিরে ফিরে বলা বা লিখা। একই ঘটনা বার বার আসে। একটি স্বৈরাচারি সরকারের পতনের পর আরেকটি তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার আসে। তারপর আরেকটি তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার আসে। কিন্তু বার বার একই ঘটনা ঘটছে এবং এর ফলে একই কথা বলতে হয়। আমাদের যারা প্রধান লেখক রয়েছেন তারা প্রত্যেকটি ঘটনাকে ইনিয়ে বিনিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখছেন। আমাদের দেশে যে সব কলাম সাহিত্য তৈরী হয়েছে, সেগুলো অত্যন নিম্নমানের। আমাদের দেশের সব কলাম লেখকরা কোন না কোনভাবে কোন দলের অনুসারী। আমি লেখার চেষ্টা করি নিরপেক্ষ কলাম। আমার কলামে আমি চেয়েছি- আমার বক্তব্য কারো পছন্দ হতেও পারে, নাও হতে পারে। এর মধ্যে আমার কলাম নিয়ে ছয়টি বই বেরিয়ে গেল। আমি দেখলাম আমার ছয়টি বই- এর ছয়টি বাক্য কাজে লাগেনি। আমার লেখায় ভাল ভাল পরামর্শ ছিলো। কিন্তু কোন সরকার শুনেনি। আমি প্রচুর কলাম লিখেছি এক সময়, এখনো কলাম লেখার প্রচন্ড চাপ আছে আমার উপর।

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি আর কলাম লিখবো না। তখন একজন সম্পাদক আমাকে বললেন. আপনি তো নারী বিষয়ে লিখেন, আমাদেরও নারী বিষয়ে লেখা দিন মাঝে মধ্যে। বিষয়টি আমার পছন্দ হয়। আমি ছাত্র জীবন থেকে নারীবাদী সব বই কিনে রেখেছি। আমি যখন এডিনবোরায় ছিলাম, তখনও আমি নারীবাদী বই কিনেছি। কিন্তু কোনটিই আমি ভালভাবে পড়িনি। কোনটি ১০ পাতা পড়েছি, কোনটির ১০০ পাতা পড়েছি। তাছাড়া কলামগুলোতে দেখবেন- প্রত্যেকে কেমন জানি আমি আমি করেন। আমি সকালে ঘুম থেকে উঠলাম, সে দিন রাতে ভাল ঘুম হয়নি- এ ব্যাপার নিয়ে আত্মকথন হচ্ছে আমাদের কলামগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য। তারা কলামগুলোর মাধ্যেমে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করেন এবং নিজেদের কর্মকান্ডে পরিণত করছেন। তাছাড়া কলামগুলো মননশীলতায় ভুগছে। এ কলামগুলোর মধ্যে কোন মননশীলতা নেই। এগুলা হচ্ছে দলের গুণগান করা এবং অন্য দলের নিন্দা করা।

প্রশ্ন: আপনি তথাকথিত গণতন্ত্র বলতে কী বুঝাতে চেয়েছেন।

হুমায়ুন আজাদ : আমাদের দেশেতো গণতন্ত্র নেই। গণতন্ত্রের মধ্যে বাক স্বাধীনতা থাকতে হবে, মানুষের অধিকার থাকতে হবে, মানবাধিকার থাকতে হবে, মানুষের সমস্ত অধিকার রাষ্ট্রকে মেনে নিতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে সেই সব নেই। যে জন্য বলছিলাম- আমাদের দেশে সত্যিকার গণতন্ত্র নেই, এটা হচ্ছে তথাকথিত গণতন্ত্র। যেমন ধরুন- আমাদের দেশে একজন পুলিশ সাধারণ একজন মানুষকে ধরে নিয়ে যায়, তার কিছু করার থাকে না। নিউইয়র্ক সিটির একজন মেয়র রয়েছেন। তিনি কিছুতেই একজন সাধারণ মানুষকে নির্দেশ দিতে পারেন না। একজন মেয়রকে দেখে যদি কোন মানুষ পাত্তা না দেয়- তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু আমাদের দেশে একজন এমপি, একজন মন্ত্রী, একজন আমলা- তারা তো প্রভুর মত কাজ করেন। সাধারণ মানুষ

হচ্ছে তাদের দাস। বুশ এদেশের প্রেসিডেন্ট তার পক্ষে একটি ডলারও অবৈধভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশে যারা ক্ষমতায় থাকেন তারা বা মন্ত্রীরা বা এমপিরা কোটি কোটি টাকা অবৈধভাবে উপার্জন করছেন। বাংলাদেশে কোন দলই সৎ নেই। সব দলেই একই অবস্থা। বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হচ্ছে আর্থিক অনৈতিকতা। বাংলাদেশ দরিদ্র এ কথা ঠিক। কিন্তু আর্থিক অনৈতিকতা দুর করে দারিদ্র্য যদি সম্পূর্ণ মোচন করা যেতে নাও পারে কিন্তু অনেকটা কমে যাবে। ব্যবস্থা নিতে হবে অবৈধভাবে কারো পকেটে একটি পয়সাও ঢুকবে না।

আমাদের মন্ত্রীরা অসৎ, আমাদের সচিবরা অসৎ, দারোগারা অসৎ, কাস্টমস কর্মকর্তারা অসৎ। পৃথিবীতে এমন একটি দেশ কি খুঁজে পাওয়া যাবে যেখানে কোটি কোটি টাকা ব্যাংক থেকে নিয়ে ফেরৎ দেয়া হচ্ছে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে শুধু তাদের ব্যাংক খেলাপী বলা হচ্ছে। নির্বাচনে জয় লাভ করার পর সব কিছু সুদ মুক্ত হয়ে যায়- এটা কী আমেরিকায় সম্ভব? আমেরিকায় দেখা যায় রাস্তায় গাড়ি চালাতে গেলে চিন্তা করেন অন্যায় করলে টিকিট খাবে- তারা সব কিছুই আইন অনুযায়ী করার চেষ্টা করেন বা থাকার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমাদের দেশে- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বে তার কোন ক্ষমতা নেই কিন্তু তিনি বাংলাদেশে মহা শক্তিশালী- যা আমেরিকার রাষ্ট্রপতিরও নেই। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ইচ্ছে করলে বোমা মেরে পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলে, তার দল ইচ্ছা করলে, তার আত্মীয় ইচ্ছে করলে, তার কংগ্রেসম্যান, সিনেটর ইচ্ছে করলে অবৈধভাবে টাকা গ্রহণ করার সুযোগ নেই- যা বাংলাদেশে রয়েছে।

প্রশ্ন: এই সব দুর্নীতিবাজ নেতা- নেত্রীর কাছ থেকে মুক্তি পাবার উপায় কী? অন্য দিকে বুদ্ধিজীবীরাও নানাভাবে বিভক্ত এর থেকে মুক্তিরই বা উপায় কী?

হুমায়ুন আজাদ : আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়তো দলভুক্ত হয়ে গিয়েছেন। এখন তারা দলে বিভক্ত। এক দল আওয়ামী লীগ করছেন, আরেক দল বিএনপি করছেন, একদল জামাতের, এমনকি আরেক দল জাতীয় পার্টির। আরো যে সব সাম্যবাদী দল রয়েছে তাদেরও বুদ্ধিজীবী রয়েছেন। তারা কিন্তু দলীয় বুদ্ধিজীবী। আমি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত নই।

ব্যক্তিগতভাবে কে সৎ- তাতে কিছু যায় আসে না। ব্যক্তিগতভাবে আমরা কেউ সৎও নই, অসৎও নই। কিন্তু ব্যবস্থা আমাদের সৎ করে বা অসৎ করে। সেই জন্য আমাদের সঠিক ব্যবস্থা তৈরী করতে হবে। যাতে কারো পক্ষে অসৎ হবার সুযোগ না থাকে। ডেনমার্কের সঙ্গে যে গোলমাল হয়ে গেল। আমি মনে করি ডেনমার্কের আন্ডার সেক্রেটারি যা বলেছেন, তার কথা সত্য। কারণ আমি বাংলাদেশের কোন মন্ত্রী কোন সচিবকে বিশ্বাস করি না। তারা অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্থ। এর থেকে উত্তরণের জন্য সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। যিনি সবচেয়ে শক্তিশালী তিনি যদি সৎ না হন, তার অধীনে যারা রয়েছেন তারাও সৎ হবে না। আমাদের দেশে অসততার একটি স্তর তৈরী হয়েছে- যা চুঁয়ে চুঁয়ে নীচের দিকে নেমে আসে। বাংলাদেশ এত দুর্নীতিগ্রস্থ যে ভিখারীরা পর্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্থ।

প্রশ্ন: আপনি একজন আধুনিক ও মুক্ত চিন্তার মানুষ এবং আপনার লেখাগুলোও প্রথা বিরোধী। আমার প্রশ্ন হলো আপনি কবিতা কম লিখেন কেন?

হুমায়ুন আজাদ : আমি কবিতা কম লিখি এটা ঠিক। যেমন নিউইয়র্কে আপনারা আছেন, চমৎকার পোশাক পরেছেন- আমি কিন্তু চমৎকার পোশাক পড়ি একথা বলবো না। আমি স্যুট পরি না, আমি জুতো পরি না, আমি জিন্স পরি। বাংলাদেশে একজন শিক্ষকের পক্ষে জিন্স পড়া স্বস্তিকর না, তারপরেও আমি পড়ি। এমন কি আমি বিকেলে সাইকেলও চালাই। কেউ কেউ মুগ্ধ হয় কেউ বা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বাংলাদেশে এরকম একটি অবস্থা, যিনি কবি, তিনি শুধুই কবি, যিনি ঔপন্যাসিক, তিনি শুধুই ঔপন্যাসিক। আমি তো নানা বিষয়ের সাথে জড়িত। যেমন আমি কবিতা লিখেছি, প্রচুর পরিমাণে প্রবন্ধ লিখেছি, সমালোচনা লিখেছি, ভাষা বিজ্ঞান, উপন্যাস- কিশোরদের জন্য রচনা এবং কলাম লিখেছি। আমি যদি সুরের কবিতা লিখতাম তাহলে হয়ত এখন আমার ৩০টির মত বই থাকতে পারতো। নানা দিকে আমাকে লিখতে হচ্ছে। আমি বাধ্য হয়ে লিখছি।

আমার ভিতরের যে বোধ সেটাকে মুলায়ণ করি। আমি যখন বোধ করি যে আমার প্রবন্ধ লেখার মনোভাব জেগেছে তখন আমি প্রবন্ধ লিখি, যখন মনোভাব জাগে উপন্যাস লেখার তখন উপন্যাস লিখি। কবিতা আমি খুব কমই লিখেছি। বাংলাদেশই এক মাত্র দেশ যেখানে মনে করা হয়- কবিদের হাজার হাজার কবিতা লিখতে হবে। আমি তা মনে করি না। শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে যেমন মালারসহ আরো যারা রয়েছেন, তাদের কবিতা সংখ্যা বড় জোর ১০০ শ। কিন্তু আমাদের দেশে কবি হতে হলে হাজার হাজার কবিতা লিখতে হবে। হাজার হাজার ছোট বড় লাইন লেখা এগুলো কবিতা নয়। আমি তখনই কবিতা লিখি যখন আমি গভীরভাবগ্রস্থ হই। যারা আমার বই এর নিবীড় পাঠক তারা বিষয়গুলো নিশ্চয় বুঝবেন- আমার উপন্যাসগুলোর মধ্যে এক ধরনের কবিতা রয়েছে। আমি আরো একটি জিনিস বোধ করি যে, গত ১৫ বছর ধরে আমাদের রাজনীতি যেমন দুষিত হয়ে গিয়েছে, সমাজ যেমন দুষিত হয়ে গিয়েছে, আমাদের বাংলা ভাষা এবং বাঙালির আবেগও অনেক দুষিত হয়ে গিয়েছে। এই দুষিত অবস্থা থেকে আমাদের পরিশুদ্ধ করা দরকার।

প্রশ্ন: সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে আপনার মুল্যায়নটা কি?

হুমায়ুন আজাদ : একটি জাতির যখন সব দিকে পতন ঘটে, তখন সব দিকেই পতন ঘটে। বাংলাদেশের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দশক হচ্ছে ষাটের দশক। ষাটের দশকে বাংলাদেশের বাঙালিরা আধুনিক হয়ে উঠেছেন, বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। অসাধারণ কবিতা, উপন্যাস লেখা হয়েছে। ঐ সময়ে আমাদের মধ্যে স্বাধীনতার জন্য স্পৃহা তৈরী হয়েছিলো। স্বৈরাচারের কারণেই বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে। এখনো কিন্তু ৫০ এবং ৬০-এর দশকের যে সব লেখকরা ছিলেন তাদের সৃষ্টিই সেরা ছিলো। আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একটি পতন সৃষ্টি হয়েছে। এটা অবশ্য বিস্ময়করও নয়, ভীতিকরও নয়। কারণ শিল্প- সাহিত্য- এগুলো ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় আবার পিছনেও যায়। উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনার পর দেখা যাবে যে- কয়েক বছর উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা হলো না, তারপর নিকৃষ্ট সাহিত্য রচনা হলো। এটা ইংরেজি সাহিত্যে হয়েছে, মার্কিন সাহিত্যে হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষেত্রেতো দেখা গেল- ৪০ এর দশকের পর উকৃষ্ট সাহিত্য রচনা হলো না। মার্কিন সাহিত্যেও তাই। শিল্প সাহিত্য শুধু উৎকর্ষ থেকে উৎকর্ষের দিকে যায় না- সেটা অনেক সময় অপকর্ষের দিকেও যায়। ৫০ এবং ৬০ এর দশকের লেখকরা যে উচ্চতা অর্জন করেছিলেন- ৭০-৮০-৯০ এর লেখকরা সেই উচ্চতায় পৌঁছাতে পারেন নি।

প্রশ্ন: জনপ্রিয়তার দিক থেকে ষাটের দশকের লেখকদের চেয়ে বর্তমান সময়ের বেশ কয়েকজন লেখক জনপ্রিয় বেশি- তারপরও কি আপনি সেই কথা বলবেন?

হুমায়ুন আজাদ : যেমন ধরুন্ন হ্যারেন লরিন্সই। তিনিও প্রচন্ড জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু দেখা যাছে ইংরেজি সাহিত্য এবং মার্কিন সাহিত্যে তার কোন স্থান নেই। ইউরোপের জনপ্রিয় সাহিত্য হচ্ছে প্রাপ্ত বয়স্কদের জনপ্রিয় সাহিত্য। এগুলোর কোন মুল্য নেই। এগুলো হচ্ছে সাবওয়ের সাহিত্য, মেট্রো সাহিত্য। আমাদের দেশের যে জনপ্রিয় সাহিত্য সেগুলো হচ্ছে- অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সাহিত্য। এগুলো হচ্ছে চার পরমার সাহিত্য, টেলিভিশনের নিম্ন মানের নাটকের সাহিত্য।

প্রশ্ন: জীবনে কখনো প্রেম করেছেন কি বা প্রেম বিষয়ক কোন স্মৃতি আছে কি?

হুমায়ুন আজাদ : আমি মুলত বাল্যকাল থেকেই একা থাকতে চেয়েছি। কিন্তু সব সময়ই আমার কিছু বন্ধু- বান্ধবী ছিলো। আমি যখন নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন আমার ২/৩ জন বন্ধু ছিলো, ২/১ জন অনুরাগিনী ছিলেন।

প্রশ্ন: অনুরাগিনীকে কি বান্ধবী বলা যায়?

হুমায়ুন আজাদ : আসলে এদের বান্ধবী না বলে বন্ধু বলাই ভাল। এরা আমাকে খুব ভালবাসতো এবং ওদের সঙ্গে আমার একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। যখন আমি গ্রামে ছিলাম। তারপরে আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি তখনও আমার বন্ধুর সম্পর্ক ছিলো কিন্তু তীব্র আবেগের মত কোন সম্পর্ক ছিলো না। আমার স্ত্রী তো আমার সহপাঠিনী। তার সম্পর্কেও আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ আবেগের ছিলো না। আমি যখন এডিনবোরায় ছিলাম তখনও আমার ২/১ জন বন্ধু অনুরাগি বন্ধু ছিলো এবং বান্ধবীও ছিলো।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমি বিবাহিত হয়েছি। অধ্যাপনা করেছি। এখনো পর্যন্ত আমার বন্ধুর সংখ্যা কিন্তু কম। কারণ আমি খুব কম মিশি তো। আমার অনেক অনুরাগিণী রয়েছেন। আমি জীবনে বার বার আলোড়ন বোধ করেছি। সেই আলোড়নতো মানুষের জীবনে বার বার আসতে পারে।

প্রশ্ন: দুই একজনের নাম বলবেন কি?

হুমায়ুন আজাদ : নাম বলা বোধ হয় আমার জন্য খুব আপত্তিকর হবে না কিন্তু তাদের জন্য আপত্তিকর হতে পারে। আমার সাথে যাদের সম্পর্ক হয়েছে (বিদেশীদের ছাড়া, আমি জানি না এখন তারা কোথায় আছে)। আমার তীব্র অনুরাগিনী ছিলেন সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীর ভাই এর মেয়ে। ওর নাম হলো লিলিয়ান। জীবনে এই প্রথম আমি তার নামটি বললাম। ওকে আমি একটি কবিতাও লিখেছি। আমি যখন এডেনবোরায় ছিলাম ও ছিলো আমার ক্লাসমেট। ও আমার প্রচুর ছবি এঁকেছে। ও আমার জন্য চাইনিজ রান্না করে দিতো। লিলিয়ান শব্দের অর্থ ঘন্টা ধ্বনি। সেতো আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিলো। অসাধরণ সুন্দরী চাইনিজ তরুণী। চিকিৎসা বিদ্যায় পড়তো। সে কখনো কবিতার কথা শুনেনি। আমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর সে কবিতা পড়তে শুরু করেছে। যদিও সে ইংল্যান্ডে বড় হয়েছে। তার বাড়ি হচ্ছে মালয়েশিয়ার পেনাং দ্বীপে। আমার কাছে প্রথম ছাত্রাবাসের রান্না ঘরে তার পরিচয়। আমি তাকে মালারের কবিতা পড়ে শুনিয়েছি, বদলেয়ারের কবিতা পড়ে শুনিয়েছি। সে খুব মুগ্ধ হয়েছে। এক সময় সে আমাকে বলেছিলো- ক্যান ইউ ম্যারি মি। তখন থেকেই তার সাথে আমার বিচ্ছিনতা দেখা দেয়।

প্রশ্ন: আপনি কি নিজেকে এখনো মনের দিক থেকে যুবক মনে করেন?

হুমায়ুন আজাদ : এটা আসলে ভুল ধারণা। আমাদের দেশের লোকেরা বিশেষ করে লেখকরা বয়স বলতে অস্বস্তিবোধ করে। আমি কিন্তু অস্বস্তিবোধ করি না। অনেকেই আমাকে বলেন, আপনাকে দেখে মনে হয় না, আপনার অত বয়স, আবার কেউ কেউ বলেন, বয়সের তুলনায় অনেক বয়সের মনে হয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে- প্রত্যেক বয়সের নিজস্ব সৌন্দর্য্য রয়েছে। প্রত্যেক বয়সের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমি ৮০ বছর বয়সে ১৮ বছরের যুবক হতে চাই না। আমি ৬০ বছর বয়সে ১৯ বছরের যুবক হতে চাই না। ২৫ বছর বয়সের যুবকের কি আছে- তার রয়েছে উত্তাল যৌবন এবং যৌবনই মানুষের এক মাত্র সম্পদ নয়। সে তো পরিপক্কতা অর্জন করেনি, অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি, সে উপলব্ধি অর্জন করেনি।

আমি ৬৫ বছরের মানুষের কাছে ৬৫ বছরের সৌন্দর্য্য আশা করি। যারা বয়স লুকানোর চেষ্টা করেন তাদের মধ্যে আসলে সম্ভোক্তির বাসনা এখনো রয়েছে। ২৫ বছরের যুবকের কাছে আমি প্রধানত সম্ভোগ বা যৌনতা আশা করতে পারি। যৌবন হচ্ছে যৌনতার কাজ। আমার এখনো অনেক কাজ বাকি। আমি যদি সব কাজ শেষ করতে নাও পারি, তাহলে আমার কোন দু:খ থাকবে না। আমি সন্ধার গোধুলি দেখতে দেখতে গরুর পা থেকে যে ধুলোকণা উঠছে সেগুলো দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে ঘরে ফিরবো। শুধু আকাশের দিকে তাকাবো এবং দেখবো কীভাবে অন্ধকার নেমে আসছে। কাজেই যৌবনকে আমি একমাত্র কর্ম সময় বলে মনে করি না।

প্রশ্ন: বাংলা টিভি নিউইয়র্কের দর্শক সম্পর্কে কিছু বলুন।

হুমায়ুন আজাদ : নিউইয়র্কের বাংলা টিভির দর্শকদের সম্পর্কে বলবো- আপনারা বাঙালি থাকবেন। সঙ্গে আধুনিক মানুষও হবেন এবং যা কিছু পুরানো, যা কিছু আপনাকে বন্দী করে রাখছে- যা কিছু আপনাদের অনাধুনিক রাখবে সেগুলো পরিহার করবেন। এখনে আমি দেখেছি- একটি সুন্দরী মেয়ে আমাকে যখন বললো- সে হিজাব পড়বে। আমি ভয় পেয়েছি। এটা হতে পারে না, আধুনিক হতে হবে। আপনারা যারা এখানে জীবিকার সন্ধানে বা স্বপ্নের সন্ধানে এসেছেন- তাদের সন্তানরা হয়ত সামনে এগিয়ে যাবে, বাংলাদেশের সাথে কোন সম্পর্কই থাকবে না।

আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

আপনাদেরকেও ধন্যবাদ।